Synopsis of Proposed Thesis

পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি চর্চায় বাংলা পত্রপত্রিকার ভূমিকা

(PURULIAR LOKASANSKRITI CHARCHAY BANGLA PATRAPATRIKAR BHUMIKA)

2024

Researcher

SHYAMAPADA MAHATO

M.A JRF NET

Under the Supervisior & Guidance of

Dr. Baidyanath Kumar

Assistant Professor, Marwari College, Ranchi

Under Ranchi university, Ranchi , Jharkhand

গবেষণার বিষয় (**Objective of Research**)

পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি চর্চায় বাংলা পত্রপত্রিকার ভূমিকা

(PURULIAR LOKASANSKRITI CHARCHAY BANGLA PATRAPATRIKAR BHUMIKA)

গবেষকের নাম : **(Name of the Research Scholar): Shyamapada Mahato**

Signature of the SUPERVISOR

Signature of the RESEARCH SCHOLAR

১) ভূমিকা (Introduction)

বর্তমানে বাংলা সাহিত্য যেভাবে পল্লবিত হয়েছে সেক্ষেত্রে পত্রপত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। মানভূম তথা পুরুলিয়ার সংস্কৃতিকে যে সব ব্যক্তি তাঁদের পত্রপত্রিকায় যেভাবে তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুবোধ বসু রায় সম্পাদিত ছত্রাক পত্রিকা, ড. সুভাষ রায় সম্পাদিত অনৃজু পত্রিকা , রমানাথ দাস সম্পাদিত অড় পত্রিকা প্রভৃতি পত্রিকাগুলির উল্লেখযোগ্য লেখকগণ হলেন মিহির চৌধুরী কামিল্যা, মহাশ্বেতা দেবী, গায়ত্রী চক্রবর্তী ,কিরিটি মাহাতো, সৃষ্টিধর মাহাতো, ড. সুভাষ রায়, সুবোধ বসু রায়, শ্রমিক সেন,রমানাথ দাস, সিরাজুল হক ,তপন ঘোষ,অবনী মাহতো, বিজয় পান্ডা, মধুসূদন মাজী, দয়াময় রায়, হারাধন মাহাতো প্রমুখ এই সব লেখক নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে স্থানীয় ভাষায় দেখিয়েছেন এই অঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে । পত্রিকাগুলি প্রথম দিকে ছোট ছোট আকারে প্রকাশিত হলেও লেখকগণ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক উপস্থাপনার মাধ্যমে পত্রিকার মান অনেক উপরে নিয়ে গেছেন এই অঞ্চলের মানুষজনের কাছে। তৎকালীন সমাজে লোকগান গুলিকে হেয় চোখে দেখা হতো । সেই সময়ের ভদ্র শিক্ষিত সমাজের মানুষজন কিন্তু এই লোক গানের মধ্যে রূপ, রীতি, ছন্দের মাধ্যমে লুকিয়ে থাকা সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গকে এড়িয়ে গেছেন । প্রেম ভাবনা ও এগুলিতে উঠে এসেছে । তা ছাড়াও বিভিন্ন লোকনৃত্যের আদব কায়দা , তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, শিল্প, পেশা দৈনন্দিন জীবন চিত্র তুলে ধরেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধ,সংগীত ও কবিতার মাধ্যমে । বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সেই সময়ের বা তার পূর্বের সংস্কৃতিকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পাই অনেক সংস্কৃতি লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় হয়েছে । এই অঞ্চলের অন্তর্গত হয়ে পত্রিকাগুলি স্থানীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে যে ভাবে তুলে ধরেছেন তার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে এই গবেষণায় ।

২)বিষয় নিরূপণ (Statement of the subject)

পুরুলিয়া বাসীদের জীবনের অনুসন্ধান করতে হলে আদিবাসী জনজাতির গভীরতর তলদেশ পর্যন্ত শিকড় খুঁজতে হবে । এদের প্রকৃত কালচার লুকিয়ে আছে এদের লৌকিক জীবনের মধ্যে , পত্রিকাগুলির লেখকগোষ্ঠী সেই অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। খুঁজে পেয়েছেন সমাজের অন্তরালের কথা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিধিবিধান, শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা প্রসঙ্গ। এই দিকগুলিকে নানা ক্ষেত্র গবেষক নানা সংখ্যাতে প্রকাশ করেছেন । মানভূমের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, উৎসব, লোকনৃত্য, মানভূমি কবিতা , হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি, বিভিন্ন জনজাতির লোক নৃত্য প্রভৃতি এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে । সাহিত্যের মোড়কে সমাজের বিভিন্ন দিককে ফুটিয়ে তুলেছেন পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীগণ । সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করে স্থানীয় সমাজে যা ছিল অন্তরালে তা প্রকাশ্যে আনাই এই গবেষণার মুখ্য বিষয় ।

৩) বিষয় অনুসন্ধান (Subject to be investigated)

পত্রিকাগুলির লেখক গোষ্ঠী সমাজ- সাহিত্য-সংস্কৃতি লৌকিক জীবনকে যেভাবে প্রণয়ণ করেছেন , তা ফিরে দেখাই আমাদের গবেষণার মূল বিষয় । পত্রিকাগুলির সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিশ্লেষণ এই গবেষণার অন্যতম মুখ্য অনুসন্ধানের বিষয়।

৪) গবেষণার লক্ষ্য (Obeject of the Research)

বর্তমানে মানভূম তথা পুরুলিয়ার আয়তন ২৮-১২বর্গ কিলোমিটার, সেখানে প্রায় ২৯৩০১৯৫ জন বসবাস করে। তাদের মধ্যে প্রায় ৫৪০৬৫২ জন আদিবাসী জনজাতি। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি,শিল্পই তাঁদের পরিচয়। পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী তাঁদের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরেছেন । মানভূমে বসবাসকারী অধিবাসী জনজাতি ও তাঁদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে বিশেষ ভাবে জানা ও মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস এই গবেষণার অভিসন্দর্ভের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৫)পূর্ব অনুমান (Hypothesis)

বিশ শতকের নব্বই এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত মানভূম লোকসংস্কৃতির পত্রপত্রিকাতে পত্রপত্রিকার অবদান গুরুত্বপূর্ণ । গবেষণা সন্দর্ভে এই পত্রিকায় সামাজিক , অর্থনৈতিক , ধর্মীয় , লোক সংস্কৃতিগত দিককে প্রবন্ধ , সংস্কৃতি, ছোটগল্প ও কবিতার নিরিখে দেখা হবে। হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি, রীতি, সমাজের সংস্কার এই বিষয়গুলিকে খুঁজে বোঝার চেষ্টা করা হবে।

৬) গবেষণার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি (Research Design and Methodology)

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে প্রথমে বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে (Descriptive Method) সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে। পরবর্তী স্তরে অনুসন্ধান মূলক পদ্ধতিতে (Exploratary Research) এর আরো পরবর্তীতে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে (Analytical Method) সত্যতা দেখানো হবে।

গবেষণা নিবন্ধে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে একাদেমি বানান অভিধান এবং ইংরেজি বানানের ক্ষেত্রে (Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English) এর নির্দেশ মান্য করা হবে। সমস্ত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রেএ মূল বানান অপরিবর্তিত রাখা হবে। তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী রচনার কাজে (MLA Handbook for Writers of Research paper)এর নির্দেশ মান্য করা হবে।

গবেষণা অধ্যায়ে বিভাজন ও পরিকল্পনা পরবর্তী অংশে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখিত হয়েছে।'

৭) তথ্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুষঙ্গ(Tools to be used in the collection of Data and Analysis)

বর্তমান গবেষণা কার্যটি মুখ্যত পত্রিকার টেক্সট ও পত্রিকায় উল্লেখিত বিষয়ের সম্পর্কীয় টেক্সটের বিশ্লেষণ নির্ভর একটি প্রকল্প।

তাই প্রয়োজন-

1) Data collection and Analysis (তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ)
2) Use Library. (গ্রন্থাগারের ব্যবহার)
3) Purchased Books (গ্রন্থ ক্রয়)

4) Use the Internet through Computer/ Smart phone and MS word (আন্তর্জালিকের ব্যবহার)

৮)সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব (Signaficance of the proposed work)

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে মানভূম তথা পুরুলিয়ার জানজাতির সমাজের সংস্কৃতি , শিক্ষা, সাহিত্য হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সত্যিই ভাবনার বিষয়। এই স্থানীয় এবং সমাজের একজন মানুষ হিসেবে এই দিকটি তুলে ধরার দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। স্থানীয় সমাজের অগ্রগতির স্বার্থে গবেষণার বিষয় হিসেবে পত্রিকাগুলির লোকসংস্কৃতি নির্বাচন করা হয়েছে।

৯) বর্তমান জ্ঞানভান্ডারের উপযোগিতা (Contribution of the Existing Knowledge)

গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণের প্রথমেই জিজ্ঞাসা ও জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার চেষ্টায় জন্ম নেয় গবেষণা । স্থানীয় ভাষা, সাহিত্য , ও সংস্কৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত । ছত্রাক ,অনৃজু, অড় প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় দীর্ঘ দিন ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে এই আঞ্চলিক ক্রিয়া কলাপ । বুদ্ধিজীবী মানুষ তথা স্থানীয় সমাজের অন্তর্ভূক্ত লেখক গোষ্ঠীর স্থানীয় ভাষা, সাহিত্য, ও সংস্কৃতির প্রতি মনোভাব কেমন তা অনুসন্ধানরত রয়েছে ।
এই পত্রিকায় সৃজনশীলতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমাজ কতটা ধরা দিয়েছে বা স্থানীয় সমাজের প্রতি লেখকগোষ্ঠীর মনস্কতা কেমন তা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়নি।

১০) ভবিষ্যতের সম্ভাবনা (Future posibility)

প্রথমত, সমগ্র গবেষণা কার্যটিতে পত্রিকাগুলির প্রকাশিত স্থানীয় সংস্কৃতি , লৌকিক জীবনের বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হয়েছে।
দ্বিতীয়ত, পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত স্থানীয় সমাজ, সংকৃতি ,ভাষা নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ থাকবে।
তৃতীয়ত, এই গবেষণা কার্যটি স্থানীয় সাধারণ মানুষের কাছে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। অপরিচয়ের অবগুণ্ঠনে আবৃত স্থানীয় জনজাতি মূলস্রোতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ খুঁজে পাবে।

সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজন (Tentative Chapterization)

ভূমিকা (Introduction)

প্রথম অধ্যায়- (First chapter) পুরুলিয়ার পরিচিতি

দ্বিতীয় অধ্যায়- (second chapter) এক নজরে পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি

তৃতীয় অধ্যায়- (Third chapter) পত্রিকাগুলির সূচনা পর্ব ও বিকাশ

চতুর্থ অধ্যায়- (fourth chapter) পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির নানান দিক

পঞ্চম অধ্যায়- (Fifth chapter) পুরুলিয়ার লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি

ষষ্ঠ অধ্যায়- (Sixth chapter) পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতিতে উঠে আসা স্থানীয় জনজাতি প্রসঙ্গ

সপ্তম অধ্যায়:- (Seventh chapter) পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যের আবহে সৃষ্ট পত্রিকাগুলির উল্লেখযোগ্য লেখকগোষ্ঠীর পরিচিতি

* উপসংহার (Conclusion)

তথ্যসূত্র (Reference)

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

ক) আকর গ্রন্থ (primary source)

খ) সহায়ক গ্রন্থ (secondary source)

গ) পত্রপত্রিকা (journals)

ভূমিকা:-

বাংলা সাহিত্যের এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে পত্রপত্রিকা । ঠিক তেমনি কোন বিশেষ অঞ্চলের সংস্কৃতি ও সমাজের সাহিত্যকে ধারাবাহিক ভাবে পরিচালিত করে সেই অঞ্চলের পত্রপত্রিকা । ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই আঞ্চলিক পত্রপত্রিকাগুলি সমাজ , শিক্ষা , লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত নানাবিধ প্রচারের দ্বারা মানুষের মনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । প্রত্যেক পত্রিকার মধ্যে নতুন লোকসংস্কৃতির আলোয় উদ্ভাসিত এমনই এক তথ্যের ভান্ডার এই ছত্রাক , অনৃজু , অড় প্রভৃতি পত্রিকা ।

সাবেক মানভূম জেলার পরবর্তিকালে পুরুলিয়া জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । রাজনৈতিক টানপড়েন ও প্রশাসনিক অসুবিধার কারণে মানভূমকে বারবার খন্ডিত হতে হয়েছে । স্বাধীনতার পরবর্তি ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর মানভূমকে লুপ্ত করে পুরুলিয়ার জন্ম ।

জন্ম থেকেই পুরুলিয়া চিরবঞ্চিত হলেও সমাজ , সংস্কৃতি , লোক উৎসব , লোক গান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ । এই পুরুলিয়াই লোক সংস্কৃতির আকরভূমি । এখানে নানা জাতি ও বিচিত্র সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস । শবর, কোল, মুন্ডা, হো কামার, কুমোর, কুড়মি প্রভৃতি । প্রচন্ড দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে দিনমজুরি ও কৃষি কাজের মধ্যে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে । এই দারিদ্রতাকে পুরোপুরি ছুঁয়ে যেতে পারেনা এখানকার সংস্কৃতি ও সারা বৎসর বিভিন্ন লোক সংস্কৃতিই তার প্রমান । প্রত্যেক মাসে বা ঋতুতে লেগেই থাকে লোক উৎসব যেমন গাজন , ভাদু, জাওয়া, করম, বাঁদনা , টুসু, জাঁথেল প্রভৃতি । তেমনি উৎসব কেন্দ্রিক লোকনৃত্যের প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায় ছো, ধুমড়ি, ঘেরা, বাহা, সহরায়, নাচনি প্রভৃতি ।

প্রথম অধ্যায় :-

পুরুলিয়া পরিচিতি

পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তসীমানায় রয়েছে আজকের পুরুলিয়া বা অতীতের মানভূম । বারেবারে সীমানা বদল হয়েছে পুরুলিয়ার। কখনো উড়িষ্যার, কখনো বিহার আবার আজকে বাংলায় । এক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে রাজনৈতিক বিন্যাস আর কিছুটা অর্থনৈতিক কারণ । ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দিল্লীর মোঘল শাসনের সময় থেকেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে ইতিহাসের পাতায় । ১৮০৫ সালে তৈরি হল নতুন জেলা নাম রাখা হল 'জঙ্গলমহল ' এর মধ্যে থাকত বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদনীপুর, ধলভূম, মানভূম, সিংভূম ইত্যাদি বিস্তীর্ন ছোটনাগপুর অঞ্চল ছিল এর অধীনে । ধানবাদও ছিল জঙ্গলমহল এর মধ্যে । ইংরেজ সেনাপতি মি. ডেন্ট এর শাসনে শেষ পর্যন্ত ১৮৩৩ সালে জঙ্গলমহল খন্ডিত করে মানভূমের জন্ম হয় । তখন মানভূমের মহকুমা ছিল দুটি পুরুলিয়া সদর ও গোবিন্দপুর (বর্তমানে ধানবাদ অঞ্চলে) ।
জঙ্গলমহল বিলুপ্তির মূল কারণ প্রশাসনিক অসুবিধা । ১৮৩৩ থেকে১৮৩৮ পর্যন্ত মানভূমের সদর দপ্তর ছিল মানবাজার কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার জন্য ১৮৩৮ সালে স্থানান্তরিত হয় পুরুলিয়াতে । অবশেষে পঞ্চম জর্জ দিল্লী থেকে ঘোষনার মাধ্যমে ১৯১২ সালে এই খন্ড যুক্ত হয় বিহার ও উড়িষ্যা যুক্ত প্রদেশের সঙ্গে। তার পর ১৯৩৬ সাল থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিহারের অধীনে ।১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর বিহারের মানভূম জেলা থেকে পুরুলিয়ার জন্ম হয় ।

দ্বিতীয় অধ্যায়:-

এক নজরে পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি

মানব জীবনকে ঘিরে সংস্কৃতির জন্ম । তাই যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন মানুষের সংস্কৃতি থাকবে । ঐতিহ্য আর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি । অরণ্য কেন্দ্রিক জীবন ধারায় মানুষের জীবন যাত্রা ছিল ভবঘুরে প্রকৃতির । প্রকৃতির কোলেই মানুষ খুঁজে পেয়েছিল বাঁচার সংস্কৃতি । প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার লড়াই এর অদম্য প্রচেষ্টা থেকেই সংস্কৃতির জন্ম । গ্রামকেন্দ্রিক জীবন ধারার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে লোকসমাজে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার ঘটে । আজো ঐতিহ্য পরম্পরা লোকসমাজ লোকসংস্কৃতির স্রষ্টা এবং প্রাণাবেগে ধরে রেখেছে লোকসংস্কৃতির পরিসরকে ।

লোক নৃত্যের প্রধান স্থান গ্রাম দেবদেবীর স্থান । তাঁর পূজো উৎসবকে কেন্দ্র করেই বসে মেলা । আনুষঙ্গিক ভাবেই এসে যায় নাচ, গান, বাজনার বিবিধ সব আসর । লোক নৃত্য একক নৃত্য নয়, দল বেঁধে সম্মিলিত ভাবেই এই নৃত্য । ১৯৫৬ সালের মানভূম খন্ড বিখন্ড হয়ে গেলেও মানভূমের সংস্কৃতি আজও অব্যাহত । মানভূমের লোক সংস্কৃতির বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যেমন-ছো , ঝুমুর , নাচনি টুসু, ভাদু, করম, বাঁদনা ইত্যাদি । এখানে কোন জাতিভেদ মান্যতা দেওয়া হয় না সকল জাতির লোক এক সঙ্গে নৃত্য অনুষ্ঠান পরিচালনা করে ।

ছো:-

মানভূমে প্রচলিত একটি জনপ্রিয় লোকনৃত্য হল ছো । এই নৃত্যের নামকরণ সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে কেউ বলেছেন- ছৌ , আবার কেউ বলেছেন ছো , আবার কেউ বলেছেন ছ । লোক গবেষক সুধীর কুমার করণ মহাশয়ের মতে ‘ শিবের গাজনকে উপলক্ষ্য করে পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় এক ধরনের লোকনৃত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে যার নাম ছো নাচ ’, ছৌ নয় । ছো ওস্তাদ স্বপন কুমার বলেছেন ‘ছো নাচে দুটি হাত দুটি পা মাথা ও পা এই ছটি অঙ্গ নাচাতে হয় তাই নাচটির নাম ছো নাচ’।

ছো নাচের উৎপত্তিস্থল পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ছাড়াও বিহারের সরাইকেলা, উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ ঝাড়খন্ডের সিংভূমে বহুদিন ধরে প্রচলিত রয়েছে । ছৌ নাচের সৃষ্টি মানভূমে হলেও প্রসার লাভ করেছে সরাইকেলা, ময়ুরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানে। ছৌ নাচের ধারক ও বাহক বলতে বোঝায় মাহাত (কুর্মী) ও ভূমিজ আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেদের । তবে হাড়ি , বাগদি শুঁড়ি সম্প্রদায়ের লোকেরা একসময় ছৌ নাচে সুনাম অর্জন করেছে ।

টুসু:-

মানভূমের অন্যতম প্রধান লোক উৎসব হল টুসু পরব বা মকর পরব । টুসু পরব কৃষিভিত্তিক লোকায়ত সমাজের ফসল তোলার উৎসব ও টুসু গান হল ফসল তোলার গান । অগ্রহায়ন সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পুরো এক মাস ধরে মানভূমে চলে টুসু পূজা । অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির সন্ধাবেলায় গ্রামের কুমারী মেয়েরা একটি পাত্রে চালের গুঁড়ো লাগিয়ে তাতে তুষ রাখে এই পাত্রটি পৌষ মাসের প্রতি সন্ধা বেলায় কুমারী মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে টুসু দেবীর উদ্দেশ্যে চিড়ে, গুড়, বাতাসা ইত্যাদি দিয়ে সমবেত ভাবে টুসু গান করে পূজা করে । টুসু পূজার জন্য কোন পুরোহিত দরকার হয় না গ্রামের কুমারী মেয়েরায় পুরোহিত ।

‘‘ পাইতব টুসু আঘন সাঁকরাতে ।
মোরা ভুলবোনা কোন মতে ।
রাতের বেলা খাঁয়ে দাঁয়ে, বইসব আল্পনাতে
দুঃখ হারী টুসু মাতা ভুল না কোন মতে । ”

ভাদু:-

দক্ষিন-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের একটি অন্যতম লোকউৎসব হলো ভাদু । ভাদু গানের উৎস হলো মানভূম জেলায় (বর্তমান পুরুলিয়া) । পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর, হুড়া, মানবাজার, বান্দয়ান,বরাবাজার প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে ভাদু গানর প্রচলন আছ । তাছাড়া বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদনীপুর, ঝাড়গ্রাম ঝাড়খন্ডের সিংভূম, হাজারিবাগ, ধানবাদের কিছু অংশ ভাদু গানের প্রচলন দেখা যায়। এটি সাধারনত গ্রামর মেয়েরা সম্মিলিত বা একক ভাবে গান গেয়ে থাকে । ভাদু গানের মধ্যে আমোদ , খেলা ধূলা ও অবসর যাপনের নানা পরিচয় পাওয়া যায় । যেমন-

''ভাদু আমার খেলতে গেছে
বাড়ি নামর বড়তলা,
কার সঙ্গ লাগবিনা ভাদু
করবি না ছলাকলা ।"

তৃতীয় অধ্যায়:-

পত্রিকাগুলির সূচনা পর্ব ও বিকাশ

ছত্রাক সুবোধ বসু রায়, অনুজু সুভাষ রায় , অড় রমানাথ দাস প্রভৃতি এই পত্রিকাগুলির সম্পাদক পত্রিকাগুলি প্রকাশ করেছিলেন । এই নামগুলির মধ্যেই রয়েছে পত্রিকাগুলির ভিতরের সাহিত্য ধারা যা কিন্তু খুব একটা সহজ নয়, যা জানতে হলে পত্রিকাগুলির সাহিত্যের ভিতরে ডুব দিতে হবে এবং সেই সাহিত্যের আঙিনায় বিভিন্ন ভাবে পর্যবেক্ষণ ও সমিক্ষার মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে হবে । সূচনা লগ্নের লেখকগুলি যদিও তাঁরা আজ অনেকেই নেই তাও তাঁদের নেপথ্যে প্রেরণা আজকের লেখকদের মধ্যে রয়েছে । প্রায় পাঁচ শতাধিক সদস্য । সেই সঙ্গে রয়েছে প্রায় শতাধিক কবি, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক গবেষকগণ উল্লেখযোগ্য হলেন- শ্রমিক সেন ,সুভাষ রায়, রমানাথ দাস স্বপন মাজী, সৌমেন চ্যাটার্জী,শশাঙ্ক মাজী, সৃষ্টিধর মাহাত, কিরীটি মাহাত দেবাশিস সরখেল , সত্যবান তন্তুবায় প্রভৃতি গুনীজন ।

পত্রিকাগুলির সূচনা লগ্নে ত্রৈমাসিক ভাবে দশ-বারো পাতা দিয়ে শুরু হলেও তা আজ বৃহৎ আকার ধারণ করেছে যা তাঁদের কল্পনার বাইরেই ছিল, আজ এই বৃহৎ সংস্করণ দেখে পত্রিকার সমস্ত লেখকগোষ্ঠি ও মানভূম তথা পুরুলিয়ার সমস্ত পাঠক ও লোক সংস্কৃতির গবেষক আজ খুবই বিশ্মিত হয়ে যান । তৎকালীন মানভূমি কবিতা , আধুনিক কবিতা ছাড়াও নানা বিষয়ে রম্য রচনা প্রকাশিত হতো এই পত্রিকাগুলির মধ্য দিয়ে ।

চলতি সমাজ জীবন কেমন যেন একটা ছন্নছড়া ভাব । সকলে আড়চোখে দেখে, কিন্তু সাময়িক ভ্রষ্টাচার তো আর মানুষের সৎসুন্দরকে তমসাকৃত করতে পারে না । তাই যা সোজা নয় তাকে সোজা পথে আনতে হবে। তাই এ কাজ করবেন সমাজের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খ্যাত - অখ্যাত , নামী- অনামী সাহিত্যিকরা । তাঁরা লেখনীর মাধ্যমে সমাজের বুকে হানতে চেয়েছেন কুঠারাঘাৎ । পুরুলিয়া তথা মানভূমের বুকে রুখা মাটির গন্ধ তবুও এই রুখা মাটির বুকেই ছিল একদিন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান । যার নিদর্শন আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মানভূমের গ্রাম গঞ্জের মাঠে ঘাটে প্রত্যন্ত অঞ্চলে । আজও মা মাসিদের কাছে বছরের প্রতটি ঋতুতে শোনাযায় লোক কাহিনী- লোকগীতি টুসু , ভাদু , ঝুমুর । এখানকার ছো নাচ , মাছানী নাচ, কাঠি নাচ,ঘোড়া নাচ,আজও আমাদের রক্তে আনে চাঞ্চল্য । অথচ এই সব নাম পরিচয়হীন কবি ও শিল্পীদের জীবনের কথা আমরা জানি না । আমরা জানিনা মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা সেই প্রাচীন ইতিহাসের কথা । আমরা সেইসব কথা জানবো এই পত্রিকাগুলির মধ্য দিয়ে ।

চতুর্থ অধ্যায়:-

পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির নানা দিক(ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রভৃতি)

ছড়া:- সাহিত্যের একটা শক্তিশালী দিক হল ছড়া । এই শব্দটির বাংলা অর্থ গ্রাম্য কবিতা । অনেকেই ছড়া সাহিত্যকে শিশু সাহিত্যের একটি শাখা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন । মুখে মুখে রচিত অন্তমিলনযুক্ত ছোট আকারের পদ্যকে সাধারনত ছড়া বলা হয় । ছড়া সাধারনত দুই, চার, ছয়, আট চরণের হয়ে থাকে , আধুনিক গদ্য কবিতার যুগে কেউ কেউ এসব মিল যুক্ত সহজ সরল ছড়া কবিতার অবস্থানকে পদ্য সাহিত্যে হালকা করে দেখেছেন । পদ্যের ছড়ার মূল পার্থক্য হচ্ছে বক্তব্যে । পদ্যের রহস্যময়তা থাকে কিন্তু ছড়ার বক্তব্য সহজবোধ্য ও স্পস্ট হয় । ছড়ার সৃষ্টি লোকজীবনে রসসঞ্চারী হয়ে ওঠে । এই সৃষ্টি সুখের আনন্দ আমদের মনন ও চিন্তনকে অনুপ্রানিত করে । আমরা আকৃষ্ট হই সব আপন করে নিই ।

ধাঁধা:-

লোকসাহিত্যে একটি অন্যতম শাখা হলো ধাঁধা । ধাঁধা আমাদের মনে শুধু ধন্দের সৃষ্টি করে না তা জটিল কৌতুহলোদ্দীপক ও রসসিক্ত এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে । সাধারণ ভাবে কোন বাক্য বা বাক্যগুচ্ছ দ্বারা একটি ভাব বা বিষয়কে রূপকের আশ্রয়ে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হলে তাকে ধাঁধা বলা হয় । ধাঁধার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন' ধাঁধা ঐতিহাসিক মূলক, ইহার প্রকাশ মৌখিক, ইহাতে এক কিম্বা একাধিক আক্ষরিক সত্য রূপেও গৃহীত হতে পারে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের মধ্যে ভাব এবং অর্থগত কোন বিরোধ থাকে না ।

উদাঃ- ক) সময় হলেই পাকে
উপর তলে থাকে । = চুল ।

প্রবাদ:-

প্রবাদ বাংলা ভাষার এক অমূল্য সম্পদ । বাংলার গ্রামগঞ্জে মানুষের মুখেমুখে আজও ঘুরে নানান প্রবাদ । অতীতে ঠাকুমা-দিদিমা ,মা-মাসিরা কথায় কথায় প্রবাদ ব্যবহার করতেন । বাংলার গ্রাম-গঞ্জে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আজও চল রয়েছে প্রবাদের ।

প্রবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই জানতে ইচ্ছা করে প্রবাদ কি ? প্রবাদের অভিধানগত অর্থ হল প্রচলিত কথা, সাধারণ ভাবে বলা যায়-লোক সমাজের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা জাত সংক্ষিপ্ত অথচ সরস বাক্যই হল প্রবাদ । কথায় কথায় যেমন উঠে আসে বিশাল ব্যঞ্জনা তেমনি থাকে ব্যঙ্গ-শ্লেষ-রসিকতা । এতে ছন্দ, মিল, অলংকার সবই আছে । সেই সঙ্গে আছে উপদেশ । আজো গ্রামীণ মানুষের জীবনকে বহুলাংশে পরিচালিত করে ।

উদাহরণ :-

(কৃষি সংক্রান্ত প্রবাদ)

১) 'যদি জল হয় মকরে ত ধান হয় টিকরে/ঠিকরে '। প্রচলিত বিশ্বাস মকরে সংক্রান্তির দিন যদি সামান্যতমও বৃষ্টি হয় সে বৎসর ভালো ধান হবে । এমন কি টিকরেও অর্থাৎ ডাঙ্গা জমিতেও ধান হবে ।

২) 'আমে বান আর তেঁতুলে টান ' এটি একটি কৃষির পূর্বাভাস সূচক প্রবাদ। যদি আমের ফলন ভালো হয় তবে ধানও ভালো হবে আর তেঁতুল যদি বেশি ফলে তবে সে বৎসর বর্ষা আসবে না অর্থাৎ খুব ফসল ভালো হবে না ।

পঞ্চম অধ্যায়:-

পুরুলিয়ার লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি

অতীতের মানভূম তথা পুরুলিয়া নাচ গানের নন্দনভূমি, সমাজের সম্রাজ্ঞী, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমান এই অঞ্চলের(জেলার) ঐতিহ্য মন্ডিত লোকসংস্কৃতি ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে । সভ্যতার সেই আদিম কাল থেকেই শ্রমজীবি মানুষ কাজ করে চলেছে । এই শ্রমজীবিদের সংঘবদ্ধ শ্রম ও সংগ্রামের ফসল হল সভ্যতা । দিন যতই গেছে মানুষ ততই সম্মুখিন হয়েছে নানা সমস্যার, ধীরে ধীরে তার সমাধানও হয়েছে । এই সমাধানকে কেন্দ্র করে সুদুর অতীত থেকে মানভূমের জনজাতি নানা সংস্কার মেনে সমাধানের পর নানা সংস্কৃতির আচার, ব্যবহার, নাচ, গান, ছড়া প্রভৃতির উদ্ভাবন করেছেন তৎকালীন সমাজ । কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই মানভূম অঞ্চলের বৈচিত্রময় এই সমাজ-সংস্কৃতি আজ নানা কারণে ম্রিয়মান এবং ক্রমশ অবলুপ্তির পথে । মানভূমের বৈচিত্রময় কৃষি-সংস্কৃতি, নাচ ,গান, আচার, আচরণ, ভাষা, খাদ্য, সাহিত্য, পালাপার্বণ, লোক বিশ্বাস প্রভৃতি অনেকগুলি শৃঙ্খলায় বিভক্ত । বর্তমান এগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে বা প্রায় অবলুপ্তির পথে, সেগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত বিস্তারিত আলোচনা গবেষণার মুখ্য বিষয় ।

হারিয়ে যাওয়া কৃষি ও কৃষি ভিত্তিক উৎসব:-

রহৈন:- সাধারনত জৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখে কৃষি বীজ বপনে উন্নত মানের চারা উৎপাদনের জন্য করা হয় গ্রামের গরাম থানে , তা আজ মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য প্রায় বিলিপ্তির পথে ।

অম্ববতী/অম্বুবাচী:- আষাঢ় মাসের ৭ তারিখে করা হয় । ধান রোপনের জন্য যাতে ধান খুব সুস্থ ও সবল ভাবে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা করা হয় বৃষ্টি যেমন পরিমান মতো পড়ে ।

জীহুড়:- জীহুড় আশ্বিন সংক্রান্তির দিন হয় । জীহুড় শব্দের অর্থ হলো বেঁচে থাকা বা দীর্ঘজীবি হওয়া । দিনটিতে যে সকল আচার আচরণ আমরা করে থাকি সেগুলোর একটি মাত্র উদ্দেশ্য দীর্ঘজীবি কামনা করা ।

দানাশস্য:- পুরুলিয়ারর ধানের কত সব নাম ছিল আমনলেয়া, ঝুলুর, সীতাসাইল, বড়হান, ধুমরি প্রভৃতি। কোথায় যেন হারিয়ে গেল, বীজ ধান ফিরে এসেছে অন্য চেহারায় ও আদলে, পাল্টেছে চাষের পদ্ধতিও । বর্তমানে সব হাইব্রিড জাতের শস্য বীজ । রুখা মানভূমের মাটিতে শস্য ছিল হরেক রকমের । সেকেলের পুরোনও ধান খুব কম ফলন হতো বলে সারা বৎসর খাবারের জোগান দিতে পারতো না ফলে কৃষকরা বিভিন্ন শস্য চাষ করত যেমন- কদো, গঁদলু, মায়ওয়া, সাকরকন্দ, মুলুন, শামুক , খই প্রভৃতি ।

কদো:-কদো আশ্বিনের শেষে কার্তিকের প্রথম দিকে মাঠ থেকে উঠে যেতো । এটির জন্য বেশি উর্বর মাটি না হলেও হতো, এটি দানা শস্য সাবু দানার মতো । সেদ্ধ করে নুন কিম্বা চিনি দিয়ে খাওয়া হতো ।

লুপ্ত ও লুপ্ত প্রায় লোকগীত:-

রুটি রুজির গান:- নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এটা নিত্য সময়ের গান । এই অবস্থায় লোক গানের একটি জনপ্রিয় উপাদান জীবিকাশ্রয়ী গানগুলি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে, সংশ্লিষ্ট পেশাগুলি হারিয়া যাওয়ার মুখে । এই ধরনের গানগুলি একসময় ঝাড়খন্ডের ধানবাদ, রাঁচি, সিলি, তামাড়, সিংভূম ,ধলভূম প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া তাছাড়া আসাম , বিহার, ত্রিপুরা পর্যন্ত গ্রাম সমাজে শ্রমিকদের কণ্ঠে শোনা যেতো এই গানগুলি কাজের সময় মুখেমুখে রচিত হতো ।

‘ আসনা পাতের দাসনা করলা পাতের দনা
দনায় দনায় মদ পরশে হিলে কানের সনা’। (বাঁদর নাচর গান)

ট্যাঁড় ঝুমুর - মানভূম তথা পুরুলিয়ার প্রাচীন এবং প্রধান লোকসংগীত হলো ঝুমুর । এখানকার প্রাণশক্তি হলো ঝুমুর । ঝুমুর নৃত্য,সংগীত ও বাদ্যের সমন্বয়ে এক অনন্য লোকসংগীত । ব্যাপ্তি ও গভীরতাও বিশাল । রাঢ় আমলে দীর্ঘদিন ধরে কুড়মি-মাহাত, মুন্ডা, ভূমিজ, সাঁওতাল, শবর, কামার ইত্যাদি জনজাতির বসবাস । এরা সারা দিনের পরিশ্রমের পর নিজেদের বেঁচে থাকার খোরাক যোগাতে ঝুমুর আসরে নাচ , গান ও বাদ্যের দলে যোগ দেয় ।

টাাঁড় শব্দের অর্থ হলো শুষ্ক বা রুক্ষ জমি । মানভূমের বেশকিছু অঞ্চল রুক্ষ হওয়ায় এখানে চাষের জন্য জল সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, বর্তমানে কিছুটা উন্নত হয়েছে । অতীতে এই রুক্ষ জমিতে চাষ করতে করতে বা গরু চরাতে চরাতে কৃষক ও রাখালের সাময়িক ফুর্তির জন্য মুখেমুখে কিছু গান রচনা করতো, আবার পরস্পর উত্তর- প্রতুত্তর দিত এই গানের মাধ্যমে এই ঝুমুরই ট্যাঁড় ঝুমুর নামে পরিচিত। এই রকম ঝুমুর দু-চার পংক্তির সহজ সরল ভাষায় রচিত হতো তাতে থাকতো মানুষ্য প্রেম, বিরহ, মান, অভিসার,মিলন, সম্ভোগ, পূর্বরাগ প্রভৃতি । যেমন-

১) ‘বাড়ির নাময় পলাশ বন
পালাব পালাব মন
লবঘন আমায় দিও দরশন ।’ (প্রেম ভাব)

লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় নাচ:- মানভূম অধুনা পুরুলিয়ার সংস্কৃতি মূলত লোকসংস্কৃতি । মানভূমে চলতে চলতে নাচ বলতে বলতে গান , সেই ধারাবাহিকতাকে আজ মানভূমবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে বহন করে আসছে । বর্তমানে মানভূম নেই তবু মানভূম শব্দটির ব্যবহার হারায়নি । গানের মধ্যে ঝুমুর গান যেমন অধিক জনপ্রিয় তেমনি নাচের মধ্যে ছো নাচের আমাদের বিশ্বদরবারে সমাদৃত । অতীতের ঘোড়া নাচ,ঘেরা নাচ, কাঠি নাচ, ডাঁইড় নাচ , ধুমড়ি নাচ, সখী নাচ, বুলবুলি নাচ,মাছানি নাচ প্রভৃতি নৃত্যের মধ্যে মেতে উঠত মানভূমের জনগণ । তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অনেক লোক নৃত্য হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে ।

ঘোড়া নাচ:- পুরুলিয়া জেলার অন্যতম জনপ্রিয় লোক নৃত্য হল ঘোড়া নাচ । অঞ্চল বিশেষে ঘোড়া নাচ ও কুঁড়ি বাজনাও বলে থাকে । ঘোড়া নাচ অনুমান করা যায় রাজাদের ঘোড়ার পিঠে যুদ্ধ করার ভাবনা থেকেই ঘোড়া নাচের উদ্ভব । ঘোড়া নাচের প্রধান উপজীব্য হল গান , গানটিও হলো আবার লোক গান ঝুমুর, সঙ্গে মূল বাদ্যযন্ত্র কুঁড়ি, টাসা, কাঁসি ও করতাল । নাচের জন্য কোন মঞ্চ থাকে না খোলা আকাশের নিচে হয় । নৃত্য শিল্পীরা ঘোড়ার কাঠামোর ভেতরে ঢুকে পড়ে গান ও বাজনার তালে তালে যুদ্ধ দৃপ্ত ভঙ্গিতে নাচ করে । পোষাকে থাকে রাজ সৈন্যদের মতো ঘাঘরা, কোমরে বেল্ট, জুতা ও মজা ।

কাঠি নাচ:- মানভূম তথা পুরুলিয়ার কাঠিনাচ এক অন্যতম আদব কায়দার নাচ । এই নাচের উৎস অনুমান করা যায় রাজতন্ত্রের যুগে সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য অতীতে লাঠিয়াল থাকত, তারা যেমন লাঠিতে আঘাত করত ঠিক তেমনি ভাবেই লাঠি দিয়ে খেলে এক বিশেষ নৃত্যশৈলীর আবিস্কার করে । এই নৃত্যের কৌশল হল শিল্পীদের হাতে এবং লাঠিতে লাঠিতে আঘাত করে এক বিশেষ প্রকার নাচের সঙ্গে থাকে ঝুমুর গান ও বাদ্য যন্ত্র থাকে মাদল, করতাল, টাসা, নাগড়া, ঝুনঝুনি, বাঁশি প্রভৃতি। এটা মূলত পুরুষদের নৃত্য।

ঘেরা নাচ:- নাচের উদ্ভব প্রকৃতি থেকে । ‘ঘেরা’ নামটি শুনলেই বাঝা যায় একটি আত্মরক্ষা মূলক বিশেষ নাচ । ঘেরা হতে পারে গোল, আয়তকার,বা বৃত্তাকার যে কোনই । প্রাকৃতিক ভাবেই শিখেছে মানুষ ফসলকে ঘেরার মধ্যে টিকিয়ে রাখার বন্য জীবজন্তুর হাত থেকে ,ঠিক তেমনি কোন শত্রু পক্ষের হাত থেকে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য এক বিশেষ প্রকার নৃত্য এই ঘেরা নাচ । নৃত্যের সময় গান ঝুমুর সঙ্গে মেয়ে পুরুষ সন্তান সকলে একত্রিত হয়ে ঘেরার মাধ্যমে নাচ চলতে থাকে বাজনার তালে তালে । বাজনার মধ্যে থাকে ঢোল ,মাদল, করতাল, বাঁশি প্রভৃতি । এটি আসলে সামাজিক বন্ধন নাচ বা ঘেরা নাচ ।

ষষ্ঠ অধ্যায়:-

মানভূম লোকসাহিত্যে উঠে আসা স্থানীয় জনজাতি প্রসঙ্গ

নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানের দেশ আমাদের ভারতবর্ষ । ঠিক তেমনি ভারতবর্ষের মধ্যে আমদের পুরুলিয়ারও একি অবস্থা । এখানে নানা ধর্মের নানা জাতির বসবাস । পুরুলিয়ার আদিবাসী জনজাতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, শবর,বিরহড়, লোহার প্রভৃতি । এছাড়া এই অঞ্চলে লোকজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে আছে আরো অনেক জনজাতি । যেমন- ডোম,হাড়ি, বাউরি , কামার, কুমার, কুড়মি, জেলে, তাঁতি প্রভৃতি । সকল জাতির এক একটি জাতি সত্তা রয়েছে এই জাতিসত্তায় বাঁচিয়ে রেখেছে তাঁদের সমাজ এবং সমাজের আচার ব্যবহার ।

শবর:- মানভূমের প্রাচীনতম জাতিগুলির মধ্যে এক অন্যতম জনজাতি হল শবর । এরা প্রচন্ড বলশালী, সুঠাম স্বাস্থের অধিকারি এই জনজাতি । এরা একটু যাযাবর জাতিয় ধরনের পাহাড় জঙ্গলের অধীবাসি এই জনজাতি , এরা ছোট ছোট দলে একত্রিত হয়ে বসবাস করে । এক এক জায়গায় খাদ্যসম্ভার, ফলমূল, পশুপাখি ক্রমশ কমে এলে পাশের এলাকার চলে যেত । শবরদের জীবন জীবিকার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই, যাযাবর জাতিয় এদের নেই কোন নিজস্ব জমিজমা, কৃষিকাজ জানে না, এরা শ্রমিকের কাজও বেশি করে না । এরা জঙ্গলের ফলমূল, পশুপাখি শিকার করে খেয়ে এদের দিন যাপন হয় । তাই এদের কোন স্থায়ি বসবাস করার জন্য ঘরবাড়ি করতো না ।

কুড়মি:- কুড়মি জাতি ভারতের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠিগুলির মধ্যে অন্যতম । দক্ষ কৃষিজীবি সম্প্রদায় হিসেবে এই জনগোষ্ঠির মানুষ আজ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে এক বিরাট সংখ্যায় । যুগ যুগ ধরে তারা পরম্পরাগত সমাজ বদ্ধতা, শাসন পদ্ধতি ভাষায়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অক্ষুন্ন রেখে স্বক্রীয়তা বজায় রেখে চলেছে অন্যান্য আদিম জনগোষ্ঠির মতোই । ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেললেও ঝাড়খন্ড ও পুরুলিয়ার কিছুটা অংশ জুড়ে তা অক্ষুন্ন রেখেছে । বিশিষ্ট গবেষক ড. বিনয় মাহাতোর মতে কুড়মি জাতি অন্যান্য আদিবাসী জনজাতি সাঁওতাল, ওঁরাং, হো,ভূমিজ, প্রভৃতিদের মতোই সংস্কৃতি রয়েছে । কুড়মিরা শিব লিঙ্গ ও প্রকৃতির পূজা করে কারণ তারা প্রকৃতি বিশ্বাসি, প্রকৃতিই তাদের কৃষির মূল উৎস । এছাড়াও পেষা হিসেবে ছো নাচ করে থাকে। এছাড়া টুসু,ভাদু। জাওয়া , করম ,জিতা, ছাতা প্রভৃতি উৎসবের মধ্যে দিয়ে সারা বৎসর মেতে থাকে ।

সপ্তম অধ্যায়:-

পুরুলিয়ার লোক সংস্কৃতির পত্রিকাগুলির উল্লেখযোগ্য লেখকগোষ্ঠীর পরিচিতি

Field Work

উপসংহার:-

পত্রিকাগুলির প্রথম থেকেই উঠে এসেছে অতীতের মানভূম তথা পুরুলিয়ার সাহিত্যে সংস্কৃতির নানা বাস্তব পরিচয় । সুদীর্ঘ কাল থেকে মানভূমে নানা জাতির বসবাস , সময় থেকেই সকল জাতির নিজস্ব জাতিসত্তা নিয়ে গড়ে তুলেছে সমাজে সংস্কার ও সংস্কৃতি । শিখেছে জঙ্গলাপূর্ণ জায়গায় বেঁচে থাকার বিভিন্ন আদব কায়দা , নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যার ধারা আজো বয়ে চলেছে।

মানভূমের পরিব্যপ্ত সমাজ ও সমগ্র সংস্কৃতিকে পত্রিকার মধ্যে তুলে এনেছেন এ এক বিশাল কর্মপ্রচেষ্টা । শুধুমাত্র সমাজে লোকসংস্কৃতি নয় বিভিন্ন রম্য রচনা, মানভূমি কবিতার মধ্যে উঠে এসেছে তৎকালীন ও বর্তমান সমাজের অবস্থাকে । মানভূমে অতীতের সমাজের আচার ব্যবহার ও বর্তমান আচার ব্যবহার তুলেধরে দেখিয়েছেন অনেক লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় হয়েছে, ঠিক তেমনি নাচ, গান,কৃষি, পার্বনের ক্ষত্রেও সে আগের মতো সচল পরিবেশের মধ্যে চল নেই অনেক লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায়ের মধ্যে চলে যাচ্ছে ক্রমশ । রুখা মানভূমে বিভিন্ন আদিবাসী সাঁওতাল , শবর, কুড়মি প্রভৃতি জাতির অভাব অনটন থাকলেও বেঁচে থাকতে হয় দুঃখ ভুলবার জন্য বিভিন্ন লোকগান ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে । এই লোক গানেই তাঁদের সুখ-দুঃখ তুলে ধরে সমাজের সব স্তরের মানুষজনের কাছে। অতীতে মানভূমের সীমানা বার বার পরিবর্তন হলেও সেই মানভূমের লোকগান, লোকনৃত্য, লোক উৎসবগুলিকে আজো তার ক্রমাগত পরিচর্যা করে বাঁচিয়ে রেখেছেন পূর্ব আদিবাসী জনজাতি , বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদের সমাজ , সংস্কৃতি ও ভাষা সাহিত্যকে । ভারতের আদিবাসী জনজাতি যে দল বদ্ধ ভাবে বাঁচতে শিখেছিল সেই থেকেই দলবদ্ধ ভাবে বিভিন্ন লোকগান ও লোক নৃত্যের ধারা আজো বহন করে চলেছে মানভূমের ঐতিহ্যের ইতিহাসকে ।

গ্রন্থপঞ্জী

পত্রপত্রিকা

১) 'অনৃজু' পত্রিকা- সম্পাদক- ড. সুভাষ রায়- অনৃজু প্রকাশনী

২) 'ছত্রাক' পত্রিকা - সম্পাদক- শ্রমিক সেন- ছত্রাক প্রকাশনী

৩) 'অড়' পত্রিকা- সম্পাদক- রমানাথ দাস

৪) 'মন্দির' পত্রিকা - সম্পাদক- মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

৫) 'ধামসা মাদল'- সম্পাদক - অরুপ শান্তিকারী

সহায়ক গ্রন্থ

১) সীমান্ত বাঙলার লোকযান- সুধীরকুমার কনণ- করুনা প্রকাশনী , প্রথম সংস্করণ ১৩৭১বঙ্গাব্দ , পরিমার্জিত সংস্করণ পৌষ-১৪০২

২) লোকসংস্কৃতির দর্পণে পুরুলিয়া- সম্পাদক- কার্তিককুমার মন্ডল - সংবেদন প্রকাশনী , প্রথম সংস্করণ- ২২জুলাই ২০১৮

৩) জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয়- সম্পাদক বরুনকুমার চক্রবর্তী প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০১৭

৪) পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতি - ড. সুভাষ রায় , রাঢ় প্রকাশন ,২০২২

৫)বাংলার লোক সংস্কৃতি - ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৬)লোকায়ত ঝাড়খন্ড - ড. বিনয় মাহাতো

৭)ঝাড়খন্ডের লোক সাহিত্য - বঙ্কিম চন্দ্র মাহাতো